স্বালাতে মুবাশ্‌শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মুনাজাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত প্রসঙ্গে

নামাযী যখন নামায পড়ে তখন সে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করে। আল্লাহর সাথে নিরালায় যেন কানে কানে কথা বলে। (মুঅত্তা, মুসনাদে আহ্‌মদ ২/৩৬, ৪/ ৩৪৪)

নামাযের মাঝেই আব্দ (দাস) মাবুদের (প্রভুর) ধ্যানে ধ্যানমগ্ন থাকে। যেন সে তাকে দেখতে পায়। যতক্ষণ সে নামাযে থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। তিনি তার প্রতি মুখ ফিরান এবং সালাম না ফিরা পর্যন্ত তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন না। (বাইহাকী, সহীহুল জামে’১৬১৪ নং)

পরক্ষণে যখনই সে সালাম ফিরে দেয় তখনই সে মুনাজাতের অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দূর হয়ে যায় নৈকট্যের বিশেষ যোগসূত্র। বান্দা সরে আসে সেই মহান বিশ্বাধিপতির খাস দরবার থেকে। সুতরাং তার নিকট কিছু চাওয়া তো সেই সময়ে অধিক শোভনীয় যে সময়ে ভিখারী বান্দা তাঁর ধ্যানে তার নিকটে ও তাঁর খাস দরবারে থাকে। অতএব সেই নৈকট্যের ধ্যান ভঙ্গ করে এবং মহানবী (ﷺ) এর নির্দেশিত মুনাজাত থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় মুনাজাত সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নয়।

অবশ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, একদা সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে কোন্‌ সময় দুআ অধিকরূপে কবুল হয় - সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, “গভীর রাতের শেষাংশে এবং সকল ফরয নামাযের পশ্চাতে।” (তিরমিযী, সুনান ৩৪৯৯, নাসাঈ, সুনান আমালুল ইয়াউমি অল্লাইলাহ্‌ ১০৮নং, মিশকাত ৯৬৮ নং) হাদীসটি অনেকের নিকট দুর্বল হলেও আসলে তা হাসান। (তিরমিযী, সুনান২৭৮২নং)

সুতরাং এটাই হচ্ছে ফরয নামাযের পর মুনাজাত করার প্রায় সহীহ ও সব চেয়ে বড় দলীল, যদিও এতে হাত তুলে দুআর কথা নেই। এইখান হতেই ধোকা খেয়ে মুনাজাত-প্রেমীরা উদ্ভাবন করেছেন যে, ‘ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হয়। আর হাত তুলে দুআ করলে আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তাছাড়া নামাযের পর লোক ও জামাআত বেশী থাকে। আর জামাআতী দুআ বেশী কবুল হয়।’ ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে আযানের সময়, আযান ও ইকামতের মাঝে, ইকামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময় ও আরো যে সব সময়ে দুআ কবুল হয় সে সব সময়ে কৈ জামাআতী দুআ নজরে পড়ে না। অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কেবল ফরয নামাযের পর দুআ।

শুরুতে একটা কথা খেয়াল রাখা উচিৎ যে, ইবাদত যখন, যেভাবে, যে গুণ, সংখ্যা ও পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকটি ইবাদত সেই গুণ, পদ্ধতি, সংখ্যা ও সময় অনুসারে করা জরুরী। অনির্দিষ্ট বা সাধারণ থাকলে তা কোন গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা বিদআতের পর্যায়ভুক্ত।

সুতরাং দুআর এক সাধারণ নিয়ম হল, হাত তুলে দুআ করা। অর্থাৎ কেউ নিজ প্রয়োজন সাধারণ সময়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে হাত তুলে করবে। এখন যদি কেউ বলে, ‘আমি আমার প্রয়োজন নামাযে চাই বা না চাই,

নামাযের পরে রসূলের বা নিজের ভাষায় হাত তুলে চাইব'- তাহলে তার প্রথমে জানা উচিৎ যে, নামাযের পর একটি নির্দিষ্ট সময়। আর তাতে রয়েছে নির্দিষ্ট ইবাদত (যিকর-আযকার)। অতএব ঐ নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়ত কি করতে নির্দেশ করেছে? যা করতে নির্দেশ করেছে তার নিয়ম কি? ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনুরুপ সাধারণ নিয়ম সংযোজন করা যাবে না। করলেই তা অতিরঞ্জন তথা বিদআত রুপে পরিগণিত হবে। ফলকথা, তাকে দেখতে হবে যে, ঐ নির্দিষ্ট ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরুপে দুআ বা মুনাজাতের নির্দেশ শরীয়তে আছে কি? নচেৎ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (শরীয়তের) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী মুসলিম, মিশকাত১৪০নং) "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম ১৭১৮নং)

এবার প্রশ্ন থাকছে উপরোক্ত হাদীস মুনাজাতের স্বপক্ষে দলীল কি না?

উক্তহাদীসে যে 'দুবুর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ হল, পিঠ, পাছা, পশ্চাৎ বা শেষাংশ। যাঁদের অর্থে 'দুবুর' মানে 'পরে', তাঁদের মতে এই হাদীসটি ফরয নামাযের পর দুআ বা মুনাজাতের বড় দলীল। (যদিও হাত তুলে নয়।) কিন্তু উক্ত হাদীসে 'দুবুর' শব্দের অর্থ পরে করা ঠিক কি ?

এখন যদি বলি, 'গরুর দুবুর (পাছা)', তাহলে শ্রোতা এই বুঝবে যে, গরুর পাছা দেহের অবিচ্ছেদ্য পিছনের অঙ্গ। তার দেহাংশের বাইরের কিছু নয়। সুতরাং নামাযের দুবুর, বা পাছা অথবা পশ্চাৎ বলতে বুঝা দরকার যে, তা নামাযেরই শেষ অঙ্গ বা অংশ। নামাযের বাইরে কিছু নয়; অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বের অংশ।

অবশ্য 'দুবুর' (পশ্চাৎ) বলে পরের অংশকেও বুঝানো যায়। যেমন যদি বলি, 'ইমাম সাহেব বাসের দুবুরে (পশ্চাতে বা পেছনে) দাঁড়িয়ে আছেন।' তাহলে ইমাম সাহেবকে যে দেখেনি সে শ্রোতা দুই রকম বুঝতে পারে; প্রথমত: এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনের অংশে বাসের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর দ্বিতীয়ত: এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনে রোড (বাসের বাইরে) দাঁড়িয়ে আছেন। আর এক্ষেত্রে শ্রোতার দুই প্রকার বুঝাই সঠিক, ভুল নয়। কিন্তু ইমাম সাহেবের আসল দাঁড়াবার জায়গা বাস্তবপক্ষে একটাই, বিধায় অপরটি অসম্ভব।

সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ যদি 'নামাযের পশ্চাতে অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বে দুআ কবুল হয়' বলি, তাহলে একথাও বলতে হয় যে, 'সালাম ফেরার পূর্বেই তাসবীহ-তাহ্লীলও করতে হবে।' কারণ ওখানেও 'দুবুর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থে উলামাগণ নামাযের পর যিক্র পড়ার কথা বলে থাকেন। অতএব উক্ত দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যা খুঁজতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে। যেহেতু মহানবী (ﷺ) এর এক উক্তিকে তাঁর অপর উক্তি বা আমল ব্যাখ্যা করে। চলুন এবারে আমরা তাই দেখে 'দুবুর' এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করি।

সালাম ফেরার পরে কি করা উচিৎ সে ব্যাপারে আল্লাহর এক নির্দেশ হল, "অতঃপর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর----।" (কুরআন মাজীদ ৪/১০৩) "তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাযের পরেও।" (কুরআন মাজীদ ৫০/৪০) তাই তো আল্লাহর নবী (ﷺ) এর আমল ও অভ্যাস ছিল সালাম ফিরার পর আল্লাহর যিক্র করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) "আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম--- " বলার মত সময়ের চেয়ে অধিক সময় সালাম ফেরার পর বসতেন না। (মুসলিম, সহীহ মিশকাত ৯৬০ নং)

সাওবান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করে "আল্লা-হুম্মা

আন্তাস সালাম---- “ বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন সালাম ফিরতেন তখন উঁচু শব্দে বলতেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু ---।” (মুসলিম, মিশকাত৯৬৩ নং) (এ ব্যাপারে ফরয নামাযের পর যিক্রের আলোচনা দেখুন।)

সালাম ফিরা হলে তিনি মহিলাদের জন্য একটু অপেক্ষা করতেন, যাতে তারা পুরুষদের আগেই মসজিদ ত্যাগ করতে পারে। অতঃপর তিনি উঠে যেতেন। (বুখারী ৮৩৭)

সামুরাহ্ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, ফজরের নামায শেষ করে আল্লাহর নবী (ﷺ) আমাদের দিকে ফিরে বসে বলতেন, “গত রাত্রে তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে?” অতঃপর কেউ দেখলে সে বর্ণনা করত। নচেৎ তিনি নিজে স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতেন। (বুখারী, মিশকাত ৪৬২১ নং)

অবশ্য একদা কা’বা শরীফের নিকট মহানবী (ﷺ) এর নামায পড়া কালে কুরাইশের দুষ্কৃতিরা তাঁর সিজদারত অবস্থায় ঘাড়ে উটনীর (গর্ভাশয়) ফুল চাপিয়ে দিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খবর পেয়ে ছুটে এসে তা সরিয়ে ফেলেন। এহেন দুর্ব্যবহার ফলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) নামায শেষ করে উচ্চস্বরে ঐ দুষ্কৃতিদের জন্য বদ দু’আ করেন এবং তা কবুলও হয়ে যায়। (বুখারী ২৪০, মুসলিম ১৭৯৪ নং)

কিন্তু সে নামায ফরয ছিল না নফল, তা নিশ্চিত নয়। পরন্তু এতে হাত তোলার কথা নেই। তাছাড়া এটি ছিল সাময়িক বদ দু’আ; যা তাদেরকে শুনিয়ে করা হয়েছিল।

আর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি ফজরের নামাযে সালাম ফিরে বলতেন, “আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআউ] অরিযকান ত্বাইয়িবাঁউঅআমালাম মুতাক্বাব্বালা।” (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অবশ্যই ফলপ্রসূ জ্ঞান, উত্তম রুযী এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।) (ত্বাবারানীরানী, সাগীর, মাজমাউয যাওয়াইদ১০/১১১, সহীহ ইবনে মাজাহ্ ১/১৫২) অবশ্য এখানেও হাত তোলার কথা নেই।

সুতরাং বলা যায় যে, সালাম ফিরার পর আল্লাহর নবী (ﷺ) অধিকাংশ সময়ে আল্লাহর যিক্র পড়েছেন। আর কখনো কখনো তিনি ফজরের পর ঐ দুআ (হাত না তুলে) পাঠ করেছেন।

পক্ষান্তরে সালামের পূর্বে তিনি (প্রার্থনামূলক) দুআ পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন, “এরপর (তাশাহহুদের পর) তোমাদের যার যা ইচ্ছা ও পছন্দ সেই মত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করা উচিৎ।” (বুখারী ৮৩৫, মুসলিম,মিশকাত ৯০৯ নং)

“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে পানাহ চায়; জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।” (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ্, আবূ দাউদ ৯৮৩নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, প্রমুখ, মিশকাত ৯৪০নং)

সালাম ফিরার পূর্বে তাশাহহুদের পর তিনি নিজেও বিবিধ প্রকার দুআ পড়ে প্রার্থনা করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং) (দুআয়ে মাসুরা দ্রষ্টব্য) এমন কি উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিতনা হতে পানাহ চাওয়ার দুআ আল্লাহর নবী (ﷺ) কুরআন কারীমের সূরা শিখানোর মত সাহাবাগণকে শিক্ষা দিতেন। তাই তো ৩ অথবা ৪ জন সাহাবী হতে উক্ত দুআর হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী ত্বাউস একদা তাঁর ছেলেকে বললেন, ‘তুমি তোমার নামাযে ঐ

দুআ পড়েছ কি? বলল, না। তিনি বললেন তাহলে তুমি তোমার নামায ফিরিয়ে পড়।’ (মুসলিম ১/৪১৩ নং)

কেননা, তাঁর নিকট উক্ত দুআর এত গুরুত্ব ছিল যে, তিনি মনে করতেন, যে দুআ পড়তে আল্লাহর নবীর আদেশ, আমল ও শিক্ষা রয়েছে তা না পড়লে নামাযই হবে না!

একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) (মসজিদে) বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামায শুরু করল। (নামাযে) সে বলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর।’ তা শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, “তাড়াহুড়ো করলে তুমি হে নামাযী! যখন তুমি নামাযে বসবে তখন আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রসংশা কর এবং আমার উপর দরুদ পড়, তারপর আল্লাহর নিকট দুআ কর।”

কিছুক্ষণ পরে আর এক ব্যক্তি নামায পড়তে শুরু করল, সে আল্লাহর প্রশংসা করে নবী (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করল। তখন তা শুনে তিনি বললেন, “হে নামাযী! (এবার তুমি) দুআ কর, কবুল হবে ।” (তিরমিযী, সুনান ৩৪৭৬, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ৯৩০ নং)

ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমি নামায পড়ছিলাম, আর নবী (ﷺ), আবু বকর ও উমর (রাঃ) (পাশেই বসে) ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ শুরু করলাম। তারপর আমি নিজের জন্য দুআ করলাম। তা শুনে নবী (ﷺ) বললেন, “তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে, তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে।” (তিরমিযী, মিশকাত ৯৩১ নং)

আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “তোমাদের কেউযখন নামাযে দাঁড়ায় সে তখন তার রবের সাথে মুনাজাত করে। অতএব মুনাজাতে সে কি বলে, তা তার জানা উচিৎ। (মুঅত্তা, মুসনাদে আহ্মদ ২/৩৬, ৪৯২৮নং) অতএব সঠিক মুনাজাতের স্থান ও দুআ কবুল হওয়ার সময় সালাম ফিরার পূর্বে নয় কি?

পরন্তু যদি ‘দুবুর’ শব্দের অর্থ ‘পরে’ ধরে নেওয়া যায় তবুও তাতে হাত তুলে মুনাজাত প্রমাণ হয় না। আর এখানে হাত তুলে দুআ করা দুআর আদব বলে এবং আল্লাহ (হাত তুলে দুআ করলে) খালি হাত ফিরিয়ে দেন না বলে এখানেও তোলা হবে বা তুলতে হবে, তা বলা যায় না। ঐ দেখুন না, জুমআর খুতবায় দুআ বিধেয়। নবী (ﷺ) বৃষ্টির জন্যহাত তুলে খুতবায় দুআও করেছেন। কিন্তু সাধারণ সময়ে খুতবায় তিনি হাত তুলতেন না। তাইতো উমারাহ্ বিন রুয়াইবাহ্ যখন বিশর বিন মারওয়ানকে জুমআর খুতবায় হাত তুলে দুআ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ঐ হাত দুটিকে বিকৃত করুক! আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে কেবল তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ইশারা করতে দেখেছি। (মুসলিম ৮৭৪, আবূ দাউদ,তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবাহ্ ৫৪৯৬ নং)

সুতরাং হাত তুলে দুআর আদব হলেও যেহেতু ঐ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি হাত তুলেন নি, তাই সলফগণ তা বৈধ মনে করতেন না। যুহ্রী বলেন, ‘জুমআর দিনহাত তোলা নতুন আমল (বিদআত)।’ (ইবনে আবী শাইবাহ্ ৫৪৯১ নং) ত্বাউস জুমআর দিনহাত তুলে দুআকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি নিজেও হাত তুলতেন না। (ঐ ৫৪৯৩ নং)

ইমাম ও মুক্তাদীগণের খুতবায়হাত তুলে দুআ প্রসঙ্গে মাসরুক বলেন, (যারা ঐভাবে দুআ করে) ‘আল্লাহ তাদেরহাত কেটে নিক।’ (ঐ ৫৪৯৪ নং)

সুতরাং একথা স্পষ্ট হল যে, ফরয নামাযের পর দুআ বৈধ ধরা গেলেও হাত তুলে দুআর আদব বলে হাত তোলা এখানেও বিদআত হবে, যেমন জুমআর খুতবায় হবে। কারণ নামাযের পরে মহানবী (ﷺ) এর আদর্শ ও তরীকা

আমাদের সামনে মজুদ।

এ তো গেল একাকী হাত তুলে মুনাজাতের কথা। অর্থাৎ একাকী নামাযীর জন্যও বিধেয় নয় ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা ।

বাকী থাকল জামাআতী দুআর কথা, তো তার প্রমাণ আরো দুঃসাধ্য। যাঁরা করেন বা করা ভালো মনে করেন তাঁরা বলেন, যে, ‘জামাআতের দুআ একটি সুবর্ণ সুযোগ।’ এর প্রমাণে তাঁরা এই যুক্তি পেশ করেন যে, ‘জামাআতে দুআ করলে দুআ কবুল হয়। একাকী অনেকের দুআ কবুল নাও হতে পারে। সুতরাং পাঁচজন ভালো লোকের ফাঁকে একজন মন্দলোকেরও দুআ কবুল হয়ে যায়!’ তাঁরা আরো বলেন, ‘কোন নেতার কাছে কোন দাবী বা আবেদনের ব্যাপারে একার চেয়ে যৌথ ও জামাআতী চেষ্টাতেই কৃতার্থ হওয়া অধিক সম্ভব।’ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথমত: যুক্তিটি দলীল-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত: দুনিয়ার ভীতু নেতাদের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার অধিকারী মহান আল্লাহকে তুলনা করা বেজায় ভুল ও হারাম।

পরন্তু যদি তাই হয়, তবে এ যুক্তি ও সুযোগের কথা মহানবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবাগণ কি জানতেন না? নাকি তাঁদের চেয়ে ওরা বেশী জানলেন? কই তাঁরা তো এই সুযোগ গ্রহণ করে অনুরুপ জামাআতী দুআ ফরয নামাযের পর করে গেলেন না?

পরন্তু তাঁরাও জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করেছেন; বিপদ-আপদের সময় ফরয নামাযের শেষ রাকআতে রুকু থেকে উঠার পর কওমায় হাত তুলে মুসলিমদের জন্য জামাআতী দুআ ও কাফেরদের জন্য বদদু’আ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০ নং)

সাহাবাগণ রমযানের বিত্র নামাযে রুকুর পূর্বে বা পরে হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। (মুঅত্তা, মিশকাত ১৩০৩ নং)

তাঁরা নামাযের ভিতরেই হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। কিন্তু নামাযের পর করা উত্তম হলে তা করতেন না কি?

একদা মহানবী (ﷺ) জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, আর পরিবার-পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।’ তখন মহানবী (ﷺ) নিজের দুইহাত তুলে দুআ করলেন। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!’ মহানবী (ﷺ) তখন তিনি নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও গেল থেমে। (বুখারী ৯৩৩নং, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদ আহ্মদ ৩/২৫৬, ২৭১)

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযের পর দুআর অভ্যাস ছিল না বলেই উক্ত সাহাবী যে সময় কথা বলা এবং কেউ কথা বললে তাকে চুপ করতে বলাও নিষিদ্ধ সেই সময় আল্লাহর নবী (ﷺ) কে দু’ দু’বার দুআর আবেদন জানালেন।

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ

করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর নামায সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন নামায মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গিয়ে কোন নামাযকে যেন অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।’ (মুসলিম ৮৮৩, আবু দাঊদ ১১২৯নং, মুসনাদে আহ্‌মদ ৪/৯৫, ৯৯)

উক্ত হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সাহাবাদের যুগেও ঐ মুনাজাতের ঘটা বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তা যে নব-আবিষ্কৃত বিদআত তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু অজান্তে লোকেরা শাস ছেড়ে আঁটিতে কামড় মারছে! যেখানে দুআ করা ওয়াজিব বা বিধেয় সেখানে না করে অসময় ও অবিধেয় স্থানে দুআ করার জন্য মারামারি! আবার কেউনা করলে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি!! কিন্তু তাও কি বৈধ?

অতএব আপনি যদি জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে শরীয়তের মাপকাঠিতে ইনসাফ করতে চান এবং দ্বিধাবিভক্ত সমাজের সংকীর্ণ মনের মানুষদের হৃদয়-দ্বারকে উদার ও উন্মুক্ত করে শৃঙ্খলা আনতে চান, তাহলে নিশ্চয় এ ব্যাপারে আসল সত্য আপনার নিকটও প্রকট হয়ে উঠবে ইন শা-আল্লাহ। পক্ষান্তরে আপনি তো চান আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর রহ্‌মত ও মাগফিরাত। তবে তা যদি এ সময় ছাড়া অন্য সময়েই পাওয়া যায়, তাহলে তা সে সময়েই চেয়ে নিতে বাধা কোথায়? কথায় বলে, “ঢেকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই?” মোট কথা আপনার প্রয়োজন আপনি আপনার নামাযেই ভিক্ষা করুন। আপনার আপদে-বিপদে ও বালা-মসীবতে নামাযেই সাহায্য প্রার্থনা করুন। বিশেষ করে আল্লাহ যেহেতু বলেন, “তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” (সূরা বাক্বারাহ্‌ ৪৫,১৫৩ আয়াত)

অতএব খেয়াল করে দেখুন হয়তো বা যে প্রয়োজন আপনি ভিক্ষা করবেন সেই প্রয়োজনের দুআ নামাযেই রয়েছে। নচেৎ অনুরুপ সহীহ দুআ বেছে নিয়ে আপনি দুআর স্থানে নামাযেই করতে পারেন। আর যদি নিজের ভাষাতেই দুআ করতে হয়, তাহলে দুআ কবুল হওয়ার আরো বহু সময় আছে। সেই সাধারণ সময়ে আপনি আপনার বিনয়ের হাত তুলে খুব করে যত পারেন আল্লাহর নিকট চেয়ে নিন। আপনি একা হলেও -আল্লাহর ওয়াদা- তিনি বান্দার দুআ কবুল করেন; যদি সঠিক নিয়মে হয়। নাইবা চাইলেন ঐ বিতর্কিত সময়ে!

তাছাড়া নামাযের ভিতর মুনাজাতের ঐ নয়নাভিরাম বাগিচায় প্রায় আটটি স্থানে দুআ করার সুযোগ রয়েছে; তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর, রুকুতে, কওমাতে, সিজদায়, দুই সিজদার মাঝে, তাশাহ্‌হুদে, রুকুর পূর্বে অথবা পরে কুনূতে এবং কুরআন পাঠকালে রহ্‌মতের আয়াত এলে রহ্‌মত চেয়ে এবং আযাবের আয়াত এলে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে নামাযী দুআ করে থাকে। (ফতহুল বারী ১১/১৩৬) আর উক্ত স্থানগুলিতে কি নিয়ে দুআ করবেন তা তো পূর্বের পরিচ্ছেদগুলিতে জেনেছেন। সুতরাং এতগুলো স্থান কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে সে সব দুআকে কেবল নামায বলেই জানে ও চেনে। দুআ বলে নয়। ফলে পূর্ণ সমর্থন করে জামাআতী দুআকে। হয়তো বা তার কারণ এই যে, মুখস্থ করে দুআ করা কষ্টকর ব্যাপার, অথচ নামাযের পর জামাআতে কেমন আরামসে কেবল ‘আমীন-আমীন’ বললেই দুআ ও সহজে কিস্তিমাত হয়ে যায়! পক্ষান্তরে ইমাম সাহেব কি দুআ করলেন তার খবর নেই, দুআর অর্থের প্রতি খোঁজ নেই, দুআর প্রতি মনোযোগ নেই - এমন দুআয় ফল কোথায়? মহানবী (ﷺ) বলেন, “আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ বিস্মৃত ও উদাসীন হৃদয়

থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।’’ (তিরমিযী ৩৪৭৯ নং)

দুআ বিদআতের ফতোয়া শুনে অনেকের অনেক রকম অভিযোগ। কেউ বলেন, ‘দুআ উঠে যাচ্ছে, কিছু দিন পর নামাযও উঠে যাবে হয়তো!’ অথচ দুআ ও নামায এক নয়। নামায হল দ্বীনের খুঁটি। আর নামাযের পর হাত তুলে দুআ তো ভিত্তিহীন। সুতরাং যার ভিত নেই, তা টিকে কেমনে?

এক মসজিদে জামাআতের সময় হয়ে এসেছিল। ওযু করতে দেরী হওয়ায় আমাদের অপেক্ষা করছিল জামাআত। এক সাহেব কারণ জানতে চাইলে কেউ বললেন, ‘আরবের মাওলানা ওযু করছেন, একটু থামুন।’ কিন্তু চট করেই এক সাহেব বলে উঠলেন, ‘আরবের লোকদের দুআ না হলে চলে, ওযু না হলেও তো চলবে!’

অনেকে বলেন, ‘কম্বলের রোয়া বাছতে সব শেষ।’

বক্তার ধারণামতে শরীয়তের সবকিছুই কম্বলের রোয়া। অর্থাৎ ফরয, সুন্নত, নফল, বিদআত সবই সমান! অথচ প্রকৃতপক্ষে বিদআত উচ্ছেদ কম্বলের রোয়া বাছা নয়; বরং ফুল বাগানের আগাছা অথবা ধানক্ষেতের ঝেড়া বাছা।

অনেকে বলেন, ‘পায়জামা খাটাতে খাটাতে শেষকালে দেখছি আন্ডারপ্যান্ট হয়ে যাবে!’ ‘ছিল ঢেকি হল শূল, কাটতে কাটতে নির্মূল - হয়ে যাবে।’

অর্থাৎ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ উঠে গেলে যেন দ্বিনের মূল অংশ বাদ পড়ে গেল! এঁদের নিকটে মুড়ি-মুড়কির সমান দর। কাক-কোকিলের কোন পার্থক্য নেই। অথচ ইসলামে অতিরঞ্জনের স্থান নেই। ইসলামে কোন কিছু এমন নেই যাতে সংযোজন করা যাবে অথবা কিছু হরাস করা যাবে। বাড়তি নখগুচুল কাটা অবশ্য বাঞ্ছিত, আঙ্গুল বা মাথা কাটা নয়। পায়জামা গাঁটের নিচে ঝুলে রাস্তার ময়লা লাগলে অবশ্যই জ্ঞানীগণ তা কেটে গাঁটের উপর পর্যন্ত করে নেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, গাঁটের নিচে কাপড় পরা হারাম। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ কাটা তো সকলের নিকট জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্মত। আর বাড়তি অংশ কাটলেই যে আসল অংশও কাটা যাবে তা জরুরী নয়। অবশ্য যাঁদের নিকটে আসল-নকলের কোন পার্থক্য-জ্ঞান নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

তাছাড়া বাড়তি ও বেশী করার প্রয়োজন কোথায়? অল্প মেহনতে ফল ও কাজ একই হলে সেটাই যথেষ্ট ও ইঙ্গিত নয় কি? নচেৎ ‘চাষার চাষ করা দেখে চাষ করলে গোয়াল, ধানের সঙ্গে খোঁজ নাই বোঝা বোঝা পোয়াল’ হবে না কি?

অনেকে বলেন, ‘ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা এতদিন নিয়মিতভাবে দুআ করে গেলেন?’ কিন্তু এর উত্তরে আমরাও প্রশ্ন করতে পারি, ‘ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা কখনো মুনাজাত করে যান নি, বা জানেন না যাঁরা এখনো মুনাজাত করেন না?’ সুতরাং দলীলই প্রমাণ করবে কে জানতেন আর কে জানতেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা ইজতিহাদে ভুল করে গেছেন, আল্লাহ তাঁদের ভুল ক্ষমা করবেন এবং তাঁরা একটি নেকীর অধিকারীও হবেন। অতএব যাঁরা না জেনে করে গেছেন তাঁদেরকে বিদআতী বলার অধিকারও কারো নেই। তবে সঠিকতা জানার পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যই ওয়াজেব।

অনেকে বলেন, দুআ তো ভালো জিনিস। ওতে ক্ষতি কি? কিন্তু ভালো হলেই যে বাড়তি করার অধিকার আছে, তা নয়। নামায ভালো বলে ২ রাকআতের স্থানে ৩ রাকআত বেশী পড়া যায় না। দরুদ ভালো হলেও জামাআতী সমস্বরে বা দাঁড়িয়ে কিয়াম করে দরুদ পড়া যায় না। এই বাড়তি করার নামই তো বিদআত।

অনেকে বলেন, ‘দুআ উঠে গেল তাই তো নানা কষ্ট, নানা বিপদ-আপদ দেখা দিচ্ছে মুসলিম সমাজে।’ অবশ্য

এমন লোকেরা নামাযের পর হাত তুলে দুআ ছাড়া আর অন্য দুআ চেনেন না। তাই তো কেউ ফরয নামাযের পর মুনাজাত না করলে অনেকে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল উদ্ধৃত করে তাকে জাহান্নামী বানিয়ে থাকেন! কারণ আল্লাহ বলেন, “তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তা কবুল করব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত (দুআ) করায় বিমুখ তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সূরা মুমিন ৬০ আয়াত)

বলাই বাহুল্য যে, এমন বক্তার নিকট দুআ এবং ফরয নামাযের পরহাত তুলে দুআর মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। তাই তো ঝোপ না বুঝেই কোপ মেরে থাকেন!

অনেকে বলেন, ‘ফরয নামাযের পর ঐরূপ দুআ করতে নিষেধ আছে কি?’ কিন্তু নিষেধ না থাকলে যদি করা যেত, তাহলে তো বহু কিছু করা যায়। আযান ও নামায ভালো জিনিস বলে সকাল ৯ টায় আযান দিয়ে জামাআত করে নামায পড়তে পারি কি? কারণ ঐ সময় ঐ আমল তো নিষেধ নয়। তবে দরুদে সমস্বরকে কেন বিদআত বলি, সমস্বরে দরুদ তো নিষেধ নয়---ইত্যাদি। এরুপ মুনাজাত নেই তার প্রমাণ হল হাদীসে বা আসারে তার উল্লেখ নেই। পরন্তু কোন ইবাদত ‘নেই’ প্রমাণ করতে দলীলের প্রয়োজন হয় না; কারণ ‘নেই’ এর দলীলই হল কুরআন-হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অবশ্য ‘আছে’ প্রমাণ করতে স্পষ্ট দলীল জরুরী। তাই তো যে কর্ম করতে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ আছে তা করাকে ‘হারাম’ বলে, ‘বিদআত’ নয়। পক্ষান্তরে যা ‘আছে’ বলে প্রমাণ নেই তা দ্বীন ও ভালো মনে করে করাকেই নতুনত্ব বা বিদআত বলে। আর মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং) “যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম ১৭১৮নং) “আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” (মুসনাদে আহ্‌মদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, মিশকাত১৬৫নং) “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।” (সহীহ নাসাঈ ১৪৮৭নং)

সুতরাং বিদআতের ভালো-মন্দ কিছু নেই। বরং তার সবটাই মন্দ। আর যা বিদআত, তা জরুরী মনে না করে করলেও বিদআত এবং কখনো কখনো করাও বিদআত। নচেৎ এর প্রমাণে দলীল জরুরী। যেমন যদি বলি, ‘কিয়াম করা বিদআত, তবে জরুরী না মনে করে করা বিদআত নয় বা কখনো কখনো করা বিদআত নয়’ তবে নিশ্চয় তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তদনুরুপ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ যদি বিদআতই হয় তবে তা অজরুরী মনে করে কখনো কখনো করা কোন যুক্তিকে দূষণীয় হবে না?

পরিশেষে এখানে ইবনে মসউদ (রাঃ) এর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করি; তিনি বলেন, “তোমরা অনুসরণ কর, নতুন কিছু রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন কর।” (সিলসিলা যয়ীফাহ্‌ ২/১৯)

(ফরয নামাযের পর একাকী বা জামাআতী মুনাজাত বিদআত হওয়া প্রসঙ্গে ফতোয়া দেখুন। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্‌ ১৭/৫৫, ২০/১৪৭, ২৪/৭০, ৯২, ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন১/৩৬৭, আলমুমতে’, শারহে ফিক্‌হ, ইবনে উষাইমীন ৩/২৭৭-২৮২, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্‌, সঊদী উলামা-কমিটি ১/৩১৯, প্রভৃতি)

সবশেষে, হাত তুলে মুনাজাত নেই বলে সালাম ফিরার পরপরই উঠে সুন্নত পড়তে লাগা অথবা প্রস্থান করা এবং যিক্‌র-আযকার ত্যাগ করা অবশ্য উচিৎ নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2921

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন